OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 844 - 850
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে পরিবেশচিন্তা

ড. তাপস ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গভঃ কলেজ, পুরুলিয়া
Email ID : tapasbanerjee634@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ecocriticism, Environmental Criticism, Ecology, Anthropocentriism, Nature, Ecocentric, Pollution, Consumerism.

Abstract
Manindra Gupta (1926-2018) was one of the Post-independence writers of West Bengal. His contributions as a writer are manifold. Although originally a poet, he has edited magazines, written novels and various types of prose for over fifty years. Manindra Gupta's literature has been discussed in the light of environmental thinking. Manindra Gupta's literature has also spoken out against this environmental crisis. The philosophy of life that he has expressed in his literature is to save the world. He is aware of the fact that human domination has plunged the world into crisis. So he protested against the aggression of the (Hu) man. This world is not just for the human beings. He spoke of the rights of various non-human animals on this earth. He did not draw the line between man and nature, keeping in mind the ecological system. He thought that human beings are also children of nature. So nature has emphasized on the friendly relationship of man with different lives of species. Instead of human-centered thinking, he emphasized nature-centered thinking.

Discussion

মণীন্দ্র গুপ্ত স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি প্রধানত কবি হলেও উপন্যাস, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী লিখেছেন। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তিনি ততটা জনপ্রিয় নন। অথচ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধারাবাহিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, কবিতা সংকলন করেছেন এবং বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক গদ্য লিখেছেন।

পরিবেশ চেতনা আসলে একটি নতুন ধারার সাহিত্য সংরূপ। বিশেষ করে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে এই ভাবনাটি বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরিবেশ চিন্তা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এর পরিধি শুধুমাত্র দেশকালের মধ্যে সীমায়িত নয়। ঠিক তেমনই জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখার মধ্যে এর চর্চা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও সাহিত্য প্রভৃতি শাখা তাদের নিজ নিজ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করছেন। তাই খুবই স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশচিন্তা একটি ‘interdisiplinary’ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শাখা একে অপরের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চিন্তা নিয়ে একটা চর্চার ধারা গড়ে উঠছে। বিশেষ করে কথা সাহিত্যের মধ্যে এর চর্চা অধিক পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকেরা বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের মধ্যে পরিবেশ চিন্তার খোঁজ পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, সমগ্র বিশ্বে যখন সত্তরের দশক থেকে পরিবেশ চিন্তা শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকেই বাংলা ভাষাতে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। তবে আবার এই একটা মতও দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ চিন্তক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচকেরা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশের রচনার মধ্যেও পরিবেশচিন্তার ছাপ দেখতে পান। কালের নিরিখে এই বিচার শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যে ও নানা মত দেখা যায়। তাই পরিবেশ চিন্তায় কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এর চর্চার একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে সেকথাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যিক মণীন্দ্রগুপ্তের রচনাকে পরিবেশচিন্তার নিরিখে দেখার অন্যতম কারণ হল যুগপ্রভাব। তিনি যে দশক থেকে সাহিত্য লেখার সচেতন সূচনা করলেন ঠিক তখন থেকে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশচিন্তার জোয়ার দেখা যায়। এই যুগকে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ বলেছিলেন 'The Ecology of Affluence'[১] অন্য দিকে তিনি ঐতিহ্য গত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবননান্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব, প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষীদের জীবন ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত এবং লোক জীবন থেকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় জীবন-যাপনের ঐতিহ্য। তিনি ছিলেন গ্রন্থকীট। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছিলেন ছোটবেলা থেকে। সেই গ্রন্থের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী তেমনি জাপানী প্রাকৃতিক চাষের প্রবক্তা ও দার্শনিক মাসানোবু ফুকুওকারগ্রন্থ, জেনধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক গ্রন্থ। এইসব কিছুর মিশ্রণে তাঁর পরিবেশ মনটি গড়ে উঠেছিল। তিনি সরাসরি কোনো পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা যুক্ত থেকেছেন কখনো কখনো। তবু তাঁর পরিবেশ সচেতন মনটির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে।

পরিবেশ তত্ত্বের আলোচনা বিভিন্ন বিষয় উঠে এলেও মূলত কতগুলি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল বাস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানকে (Ecosystem) স্বীকৃতি দেওয়া। এই বাস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞান পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের ওপর জোর দেয়। মানব সভ্যতাকে মানুষ যেভাবে গড়ে তুলেছে এই বাস্তুতন্ত্র তার থেকে অনেক আলাদা। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ও উদ্ভিদ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। অনেকটাই মানুষের ভাবনার নাগালের বাইরে। এই বাস্তুতন্ত্রে কোনো একটি উপাদান ব্যাহত হলে সামগ্রিক ভাবে বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বিগত কিছু শতাব্দী জুড়ে মানুষ নিজের উন্নতির জন্য তথা সুখভোগের জন্য এককভাবে এই বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করে চলেছে। এর ফলস্বরূপ প্রকৃতি তার ভারসাম্যকে হারাচ্ছে বলে পরিবেশবিদরা মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য হল এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়। এই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল অজস্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনেও বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই ভারসাম্য রক্ষার্থে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য না-মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদেরাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ এই সভ্যতার ওপর একক ভাবে আধিপত্য করছে। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে সরব হন পরিবেশবিদেরা। মণীন্দ্র গুপ্তও মানুষের এই আধিপত্যকে স্বীকার করতে চাননি। তাই তিনি তাঁর *কবিতাসংগ্রহ* এর ভূমিকাতে বলেছিলেন –

> "আমিতো সব সময় চেয়েছি- লোকসংখ্যা কমুক, বৈভব তৈজস কমুক, শব্দ বাক্য কমুক। মাছ পাখি পশু বাড়ুক, বন বাড়ুক। পৃথিবী শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করুক। মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে যাক বনমর্মর।"[২]

তাঁর বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি বাস্তুতন্ত্রে শুধুমাত্র মানুষের আধিপত্যকে চান নি। মানুষের অহমিকা কীভাবে বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি মানব সভ্যতাকে ভাবতে শুরু করিয়ে ছিল যে, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই স্বীকৃতি হয়তো প্রাপ্যও। কিন্তু মানুষের বৈষয়িক উন্নতি বা অবনতিতে এই পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। কারণ মানুষকে কেউ অধিকার দেয়নি অন্যপ্রাণী দের হত্যা করতে কিংবা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে।এই মুনাফালোভী, সুবিধাভোগী মানুষদের প্রতি মণীন্দ্রগুপ্তের বিদ্রুপ। তাই জীবনানন্দের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে নিজেকে জাতিদ্রোহী বলে মনে করেছিলেন –

> "মানুষের অধিকারে আমার বিশ্বাস নেই – আমি বোধ হয় জাতি দ্রোহী।"[৩]

মানুষের প্রতি এই ক্ষোভ দেখা যায় পরিবেশ দর্শনে। পরিবেশ দার্শনিকেরা মনে করেন, মানুষ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হত তাহলে সে অন্যদেরও পরনির্ভরশীল হত না। আবার মানুষ নীতি বা যুক্তিতেও শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ তা যদি হত তাহলে মানুষ খুন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অন্যান্য অপরাধ করত না। যদি মানুষ প্রকৃতই যুক্তিবান হত তাহলে সে আজ তার ভোগ কমাত। কারণ সে জানে আকাঙ্খা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে কেবল ভোগী হয়ে উঠছে এবং এই প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে। এই মানুষের বিরোধী মণীন্দ্রগুপ্ত। এই স্বার্থপর, লোলুপ মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারনোর পিছনে দায়ি ছিল মণীন্দ্র গুপ্তের যুগ। তিনি এমন এক যুগে বড় হয়ে উঠছিলেন যখন মানুষের পাশবিকতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের দেশভাগের সময়, কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখেছিলেন এই মানুষ কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে, যুগের অন্ধকারে তিনি দেখতে পান মানুষ নিজের সুখের জন্য ভোগ্য পণ্যের দিকে ছুটে চলেছে। তাই তিনি বলেন -

> "রবীন্দ্রনাথের সময় ১৯৪১ পর্যন্ত। ইতিহাস তাঁকে 'সভ্যতারসংকট' পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। জীবনানন্দ তারপর যুদ্ধকালীন পরিবর্তন দেখেছেন, পঞ্চাশের (১৯৪২-৪৩) মন্বন্তর দেখেছেন, যুদ্ধ শেষের পৃথিবীকে জেনেছেন, ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা, দেশভাগ ও নতুন স্বাধীনতার কবলে পড়েছেন। সারা জীবন আহত হয়ে শেষ অপঘাতে চলে গেছেন ১৯৫৪ সালে। জীবনানন্দ যেখানে এসে থেমেছেন আমরা তারপরে আরও দেখেছি - নকশাল আমলের নরহত্যা, রাজনীতির ক্রমাগত অধঃপতন, সোভিয়েতের বিলীন হওয়া। এই সময়ে বিশ্বাস স্থানান্তরিত হচ্ছে সমাজ থেকে ব্যক্তির দিকে, ব্যক্তি থেকে শুধু নিজের দিকে, নিজের ও সত্তা থেকে ক্রমশ তা দ্রুত সরে যাচ্ছে জড় ভোগ্য পণ্যের দিকে। এই সাঙ্ঘাতিক চাপের সময়ে 'বিশ্বাস' হঠাৎ এক্সপ্লোড করে গিয়ে আমরা হয়তো পূর্ণজ্ঞানী হয়ে যেতে পারি। আমাদের কবিতা, জীবনানন্দের পরে, অন্য কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করে আছে প্রায় চার দশক।"[৪]

এই অন্যকথা আসলে বিভিন্ন দিকের কথার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। তার মধ্যে একটি হতে পারে কবিতা তথা সাহিত্যে মানবকেন্দ্রিক চিন্তার বদলে ইকোসেন্ট্রিক বা প্রকৃতি কেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্য। তাই তাঁর সাহিত্যে মানবকেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে ইকোসেন্ট্রিক বা প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিন্তায় মানুষ ও না-মানুষ, উদ্ভিদ প্রকৃতির সমস্ত উপাদানেরও পরেই গুরুত্ব আরোপিত হয়। মণীন্দ্র গুপ্ত এই ভাবনা থেকেই তাঁর সাহিত্যকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস নুড়িবাঁদর এ কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে একটি নুড়িবাঁদর নামে একটি বাঁদর। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এই বাঁদর দেখেছে মানুষের অহমিকা, লোলুপতা এবং নিজ সুবিধের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যকে ধ্বংস করার উদ্যোগ।

একশ্রেণির পরিবেশবিদেরা মনে করেন, পরিবেশ সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা। বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র প্রাণের সঙ্গে মানুষের যে আন্তঃসম্পর্ক তা যখন থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে সেদিন থেকেই এই পরিবেশ সংকট শুরু হয়েছে বলে কেউ কেউ ভাবেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে এর বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। কেউ বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ভোগবাদী জীবনকে এর জন্য দায়ি করেছেন। মণীন্দ্র গুপ্ত সরাসরি 'বাইবেল'কে এর জন্য দায়ি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নিজের মুনাফার জন্য সেখানকার বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাসকে বিপর্যস্ত করেছিল। তিনিও পরিবেশ সংকটের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে মুনাফার বিষয় হিসাবে দেখেননি। বরং আদিবাসীদের মতো প্রকৃতি তাঁর কাছে সর্বপ্রাণময় হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সর্বপ্রাণবাদী মতে বিশ্বাসী –

> "আমি ভাববাদী নই, বস্তুবাদীও নই, হয়তো নাগা কুকিদের মতো সর্বপ্রাণবাদী।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সর্বপ্রাণবাদের ছোঁয়া তাঁর সাহিত্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁর সাহিত্যে সমস্ত প্রকৃতি কথা বলে। মানুষের কণ্ঠস্বর শুধু নয় এই প্রকৃতির সমস্ত উপাদান জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যে – যা পরিবেশচিন্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাই পিটার ব্লু ক্লাউড (Peter Blue Cloud) বলেছিলেন - "the allness of the creation,"[৬] তাই মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে মানুষ ও না-মানুষ প্রাণীদের সঙ্গে এই প্রকৃতির এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রচিত হয়। তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা-

> "গাছপালা পাখি মাছ জল জন্তু বনের পশু সবাই একদিন সারা পৃথিবীর শিশুর গল্পে ছিল, কবিতার মধ্যেও ছিল। ...কবির জগৎটি যেন এই আদিম রহস্যে টৈটম্বুর থাকে। সে যেন জীবনের সব সুখে দুঃখে দেশের উদ্ভিদ ও পশু পাখিদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর মতো পায়।"[৭]

শুধু এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল তা নয়; তাঁর সাহিত্যে জুড়ে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্য যখন থেকে তথাকথিত আধুনিক হয়ে উঠতে শুরু করে ঠিক তখন থেকে বিস্তৃতি প্রকৃতির নীরবতা ও দেখা যায় কিংবা যেটুকু দেখা যায় তাতে মানবীকরণ ঘটে। মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে তাই কখনো দেখা গেছে অলৌকিকতা, জাদু বাস্তবতার ব্যবহার কিংবা মানুষের কালজ্ঞানের প্রত্যাখ্যান। তিনি নিজে এক নতুন আঙ্গিকের নির্মাণ করেছেন বা বলা যায় করতে হয়েছে। কারণ তথাকথিত আঙ্গিকে তিনি প্রকৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষিতকে তুলে ধরতে পারতেন না। তাই দেবারতি মিত্র তাঁর *উপন্যাস সংগ্রহ* এর ভূমিকাতে বলেছিলেন -

> "কেউ কেউ মনে করেন মণীন্দ্র গুপ্তের উপন্যাস মিলান কুন্দেরা, রুশদি বা পল কোয়েলহোর লেখার সমগোত্রীয়। বাস্তব এবং পরাবাস্তবের মধ্যে এই অনায়াস যাতায়াত যেন গেরস্তের এঘর ওঘর করা। পাঠকেরও এই willing suspension of disbelief-এ কোনো আপত্তি থাকে না।"[৮]

পরিবেশ চিন্তার সঙ্গে পরিবেশ দার্শনিকদের একটা বড় ভূমিকা আছে। বিশেষ করে 'Deep Ecology' বা গভীর বাস্তুতন্ত্রের দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে তার স্বতঃমূল্যের বিচারে ভাবতে চেয়েছেন। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ভোগ প্রকৃতিকে শোষণ করছে বলে তাঁরা মনে করেন। এই ভোগবাদী জীবনকে প্রত্যাহারের কথা তাঁরা বলেন। মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এই ভোগবাদী জীবনকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটাই গ্রহণ করতে বলেছেন প্রকৃতি থেকে। তাই ভোগবাদী নাগরিক জীবনের পরিবর্তে কুড়ানীদের জীবন-যাপন তাঁর কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছে। কেননা তাদের খাবারের একমাত্র সম্বল প্রকৃতি। কিংবা তিনি আদিবাসীদের জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ও ভয়ের চোখে দেখেছে।প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একধরনের আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। তাই মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন। এই কারণেই তিনি সন্ন্যাসী, বিপ্লবী, হিপি, বেদে এবং ভবঘুরেদের জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। জাপানি কৃষিবিজ্ঞানী মাসানোবু ফুকুওকা তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছে। ফুকুওকা কৃষিকাজে আধুনিক কীটনাশক ওষুধ কিংবা আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরোধী। ফুকুওকা উন্নতি বা সমৃদ্ধির বিপক্ষে গিয়ে মানুষের সুখের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সুখের আদর্শ মণীন্দ্র গুপ্ত মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনে খুবই অল্প নিয়েজীবন-যাপন করেছিলেন। ভোগবাদী জীবনকে তাঁর বিকারও শূন্যতা বলে মনে হয়েছিল। তাই শৈশব থেকেই জীবন বদলের কথা ভেবে ছিলেন। এই বদলের প্রথম বাণী ছিল বৈষয়িক তাকে জীবন থেকেপ্রত্যাহার। তাই কবিও মণীন্দ্র গুপ্তের স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন -

> "১৯৭০ থেকে ২০১৭ সাল অর্থাৎ ৪৭ বছর মণীন্দ্র গুপ্তকে দেখছি। সাধারণ ভাবে তাঁর দুটি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়েছে। এক নম্বর - তিনি নিজেকে নিয়ে প্রায় মাথা ঘামান না, তাঁর কোথা থেকে কী হচ্ছে, হয়েছে বা হবে তা নিয়ে ভাবেন না এবং মোটামুটি নানা রকম শিল্পকাজে তাঁর একটা মাঝারি দক্ষতা আছে...তাছাড়া অতিসংক্ষেপে অনাড়ম্বর ধরনে তিনি জীবন কাটান ও লেখালেখি করেন।"[৯]

এই জীবন 'Deep Ecolgy' বা গভীর বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে গভীর মিল পাওয়া যায়।

ভোগহীন যাপনের ভিত্তি এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে এক অভিন্ন সত্তা রূপে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন তাঁর শৈশবে। তিনি ১৯৩০ এর দশকের পূর্ববাংলার এক অজ গ্রামে বড় হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় লোকায়াত জীবনের স্পন্দন তাঁর মনে গেঁথে যায়। তিনি তাঁর গ্রামেই নানা রকম গাছা-পালার সঙ্গে, প্রাণীর সঙ্গে, বিভিন্ন পাখ-পাখালির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মের নাড়ি কাটা হয়েছিল কাঁচের বাঁশের চোঁচ দিয়ে। কল্পনাপ্রবণ একাকী বালকের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ে উঠে। তাই গাছ কাটলে বা সাপকে মারলে তাঁর মনে আঘাত হত। কোন গাছের রূপ-রঙ কেমন, কোন ফলের স্বাদ কেমন - এই অভিজ্ঞতা তিনি শৈশবে অর্জন করেছিলেন। তিনি এমন একটা সংস্কৃতিতে বড় হয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রকৃতির ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ছিল। সারা বছরের খাওয়া-দাওয়া ও উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হত। অসুখ-বিসুখের ওষুধের জন্য নির্ভরশীল ছিল সেখানকার বিভিন্ন প্রাণী ও গাছ-পালার ওপর। সেখানকার অর্থাৎ এমনগোষ্ঠীতে তিনি বড় হয়েছেন যারা – "developing communities integrated with ecosystem,"[১০] তাই সেখানে প্রকৃতি শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট না হয়ে যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি থেকেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক বা ইকোসেন্ট্রিক দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করেছিলেন।

সবশেষে বলাযায়, মণীন্দ্র গুপ্ত হলেন একধরনের পরিবেশ বাদী সাহিত্যিক যিনি পৃথিবীকে সকল প্রাণের জন্য সমান ভাবে ভেবেছেন। তাঁর কাছে মানুষের থেকে প্রকৃতি অনেক বেশি বড় বলে মনে হয়েছে। এই ভাবনাটি যে খুব নতুন, তা নয়। এই ভাবনা পৃথিবীর অনেক দর্শন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত। ভারতীয় সংস্কৃতি তার দর্শন ও সাহিত্যে এই সামগ্রিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত আদিবাসী তথা চতুর্থ বিশ্বও এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমগ্র বিশ্ব আজ উন্নয়নের দিকে ছুটে চলেছে। এই উন্নয়নের তাগিদে প্রকৃতিকে শোষণ করা হচ্ছে নির্মমভাবে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে দ্রুতগতিতে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই পরিবর্তিত পরিবেশের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় -

> "কিন্তু পৃথিবী পাল্টাইতেছে। প্রকৃতি পাল্টাইতেছে। এবং দ্রুত গতিতে পাল্টাইতেছে। এই পাল্টানোর দায় মানুষেরই। কারণ প্রকৃতির উপর যথেচ্ছাচার সে-ইকরিয়াছে। প্রকৃতির যতক্ষণ সেই অত্যাচার বরদাস্ত করিবার ক্ষমতা ছিল, করিয়েছে। এখন প্রকৃতি বিরূপ। বিপদ সঙ্কেতগুলি প্রবল হইতে প্রবলতর। তবু মানুষ কখনও অগ্রগতির দোহাই দিয়া, কখনও ঐতিহ্যের ধুয়া তুলিয়া, কখনও বা নিছক সুবিধার অজুহাতে খাড়া করিয়া প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিয়া চলিতেছে। গড্ডলিকা প্রবাহের বাহিরে গিয়ে সচেতন ব্যতিক্রম ঘটানো তাহার অভ্যাসে নাই। কিন্তু সেই চেতনা এখন বিশেষ আবস্যক। মানুষের বোঝা দরকার যে, নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রকৃতির যত্ন লইতে হইবে। সমুদ্র দূষিত করিয়া, সেই দূষিত সমুদ্রের বিষাক্ত তিমির মাংস খাইয়া ঐতিহ্যকে বাঁচাইতে চাহিলে মানুষ নিজেকে সুস্থভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেনা।"[১১]

পরিবেশকে রক্ষা করার সচেতনতা থেকেই ভারত তথা বিশ্বে যত পরিবেশ আন্দোলন ঘটেছে তার মূল অভিযোগেই কিন্তু পরিবেশকে লুণ্ঠন করার জন্য। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণের কথা ভাবা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। কিন্তু এ নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক দেখা যায়। বিশেষ করে ভারতের দরিদ্র দেশগুলি নিজেদের দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কাযেলাগে। তাদের কাছে মূল যুক্তি হয়ে ওঠে, দারিদ্র্য ও অভাব দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অতি আবশ্যক। এক্ষেত্রে পাশভাত্য দেশগুলির অন্ধ অনুসরণ করা হয়। কিন্তু মানুষের উন্নয়নের নেশাতে আসলে ক্রমশ ভোগবাদী হয়ে উঠছে। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপন ত্যাগ করে মানুষ ক্রমশ শহুরে হতে যাচ্ছ। তাই দারিদ্রো অভাব দূরীকরণে বিজ্ঞানের ব্যবহার কোনো দোষের নয় ভোগবিলাসের সূচক ঊর্ধ্বমুখী হলে আরও বেশি ভয়ংকর সমস্যা মানুষ পড়বে। মানুষের ক্রম বর্ধিত চাহিদার চাপে জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস পাবে, পানীয় জলের সংকট দেখা যাব, আধুনিক যাপনের জন্য প্রয়োজন হবে বেশি মাত্রায় জ্বালানি ও শক্তি। এই জ্বালানির বেশির ভাগটাই আসে জীবাশ্মা-জ্বালানি থেকে। এই জীবাশ্মা জ্বালানি গুলি পরিবেশের ওপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস নির্গত হয়। এই সব গ্যাস প্রকৃতি শোষণ করে নিতে পারে না। ফলে এই গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং উষ্ণায়ণ ঘটে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সমুদ্রের জল বেড়ে যাবে, উওরের হিমবাহ গলতে থাকবে, জীব বৈচিত্র্যের সংকট দেখা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত মাত্রায় সাইক্লোন, বৃষ্টিপাত, খরা, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

– যা সামগ্রিক ভাবে মানুষের জীবনকেই বিপন্ন করবে। এই সচেতনতা থেকেই মানুষের পরিবেশ নিয়ে ভাবা দরকার বলে মনে করা হয়। দীপেশ চক্রবর্তী বলেন:

> "পৃথিবী ব্যাপী জীবনের উপর মানুষের এই প্রতিপত্তি দেখে কিছু বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন যে মানুষ প্রজাতিটি আজ প্রবল ক্ষমতাশালী আগ্নেয় গিরির মতোই এক ভূতাত্ত্বিক শক্তি। তাঁরা বলছেন, আমাদের এই গ্রহটির প্রাচীন ইতিহাসে আজ এক নতুন যুগ এসেছে, তা মানুষের যুগ, বা অ্যানথ্রোপসিন। কেউ বলছেন, না, তা কেন নাম হবে? এর মূলে আছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তাই নাম হোক 'ক্যাপিটালোসিন'। আজ দুটো জিনিস ক্রমশই পরিস্কার হয়ে এসেছে - যাকে আমরা 'পরিবেশ' যুগ বলি, তাকে উপেক্ষা করে মানুষের সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদি হতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত, পরিবেশ আর মানুষ দুটি আলাদা বস্তু নয়। পরিবেশেরই ফসল মানুষ, আবার মানুষের শরীরের মধ্যেই নানান জীবাণু ও ভাইরাসের রূপ নিয়ে পরিবেশ বর্তমান। বিভিন্ন প্রাণিজগৎ ও এই পৃথিবী নানা সূত্রে সম্বন্ধিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস যদি আমাদের এই সত্য স্মরণ রাখতে সাহায্য করে, এই উপলব্ধির আলোকে উন্নয়নের প্রশ্নটি ভাবায়, তাহলে তা-ইহবে তার সার্থকতা"[১২]

তাই উন্নয়ন ও প্রকৃতি সংরক্ষণ কখনও বিপরীত হতে পারেনা মানুষের জীবনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে। মানুষ যেমন নিজের পরিবেশকে বিপন্ন করছে ঠিক তেমন মানুষেই এই সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবতে পারে। তাই মানুষকে শ্রেষ্ঠ না ভাবলেও মণীন্দ্র গুপ্ত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন তার দায়িত্ব। তাই তাঁকে যখন এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়ে ছিলে চারপাশে দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশ আর প্রকৃতি তাকে কষ্টদেয় কিনা? এর উত্তরে তিনি বলেন –

> "কষ্টদেয়, তা যেমন ঠিক, আবার আমি এও জানি যে এই পুরো ব্যাপারটাই মানুষের নিজের হাতে তৈরি। তাই তার কিছু দায়িত্ব ও বর্তায় এই বদলের ফলে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলোকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও কাজ করার।"[১৩]

মণীন্দ্র গুপ্ত বাংল সাহিত্যের সেই শ্রেণির সাহিত্যিক যিনি সমকালীন পরিবেশ সংকট নিয়ে ভেবেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাই তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশের গভীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। উন্নয়ন, আর্থিক সমৃদ্ধির চেয়ে ও তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাসের সত্যতা, স্থিতিশীল উন্নয়ন, এবং মানুষসহ সমস্ত পৃথিবীকে জৈবগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে দেখেছেন।

Reference:

১. Guha, Ramchandra. *Environmentalism: A Global History.* Penguin Books, Haryana, 2016, p. 93
২. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'প্রথম প্রকাশের ভূমিকা', *কবিতাসংগ্রহ,* আদম, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭
৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকার', *গদ্যসংগ্রহ,* অবভাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৪১
৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'তাহারা অদ্ভুত লোক', *গদ্যসংগ্রহ,* অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮৬
৫. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'উওরদ্বাদশ', *গদ্যসংগ্রহ,* অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬২
৬. Cloud, Peter Blue. 'Voice Play', *The Remembered Earth : An Anthology of Contemporary Native American Literature.* Edited by Geary Hobson, University of Mexico press, Albuquerque, 1980, p. 23
৭. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'তাহারা অদ্ভুত লোক', *গদ্যসংগ্রহ,* অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮৮
৮. মিত্র, দেবারতি, 'ভূমিকা', *উপন্যাস সংগ্রহ,* অবভাস, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯
৯. মিত্র, দেবারতি, 'মণীন্দ্র গুপ্ত অল্পস্বল্প', *স্বকাল : কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা,* সম্পাদক - প্রকাশ দাস, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৮, পৃ. ১৪১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. Lynch, Tom, et al., editors. The Boiregional Imagination: Literature, Ecology and place, University of Georgia press, 2012, p. 33

১১. 'আত্মরক্ষা', সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬জুন, ২০১৮, পৃ. ৪

১২. চক্রবর্তী, দীপেশ, 'এক ওভারে চার ট্রাক প্লাস্টিক', আনন্দবাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), ৩জুন, ২০১৮, পৃ. ১

১৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'একটা ম্যাপ এঁকে যাচ্ছি, আরো জটিল, আরো সুদূর, আরো অসমাপ্ত' (কথোপকথন), *স্বকাল : কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা,* সম্পাদক- প্রকাশদাস, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৮, পৃ. ১৪১

Bibliography:

কর মহাপাত্র, সুখেন্দুবিকাশ, *প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিণাম,* সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৫

খাঁ, সুমিত্রা, *পরিবেশ দূষণের গল্প,* নবচলন্তিকা, কলকাতা, ১৯৯৭

গুপ্ত, শুভেন্দু, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

গুপ্ত, শুভেন্দু, *পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শেখালেন যারা,* পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৬

গুহ, মানসমোহন, *পরিবেশচেতনা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৯

গোস্বামী, প্রভাতরঞ্জন, *পরিবেশ ও সমাজবিদ্যা,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮৩

ঘোড়ই, সন্তোষকুমার, *পরিবেশ?,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০

চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৯

চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন, *স্বাধীনতা উওর পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫০-২০১১),* শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

চক্রবর্তী, কবিতা নন্দী, *বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা : রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ,* আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭

চক্রবর্তী, কল্যাণ, *বিপন্নপ্রকৃতি,* নিউ বেথুন প্রেস, কলকাতা, ১৯৯২

চক্রবর্তী, পার্থ, *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গ নীতি,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

চক্রবর্তী, পার্থসারথি, *আমাদের পরিবেশ,* শ্রীভূমি, কলকাতা, ১৯৯৫

Abram, M.H. *A Hand Book of Literary Terms.* Cengage Learning, New Delhi, 2009.

Andersn, Linda. *Autobiography.* Routledge, London

Bandyopadhyay, Debarati. *Rabindranath Tagore : A Life of Intimacy with Nature.* Rupa Publication, Kolkata, 2019

Barry, Peter. *Beginning Theory.* Viva Books, Kolkata, 2011

Bate, Jonatham. *The Song of the Earth.* Picador, London, 2000